... হবে, আনন্দের মধ্যে আনন্দ। ... সত্তা সত্য সব হবে,

আরোহণ অথবা বিবর্তন (Ascent or Evolution):

শ্রী অরবিন্দ মনে করেন, বিবর্তনের আগে অবশ্য 'কুণ্ডলীকরণ' (involution)। বস্তুত: বিবর্তন সম্ভব হয় কারণ কুণ্ডলীকরণ ইতিমধ্যেই ঘটেছে। এই দুই পদ্ধতির মধ্যেই যুক্ত আছে সত্তার আটটি স্তর। আধ্যাত্ম শক্তি প্রথমে জড়, প্রাণ এবং মনে অবরোহণ (discent) করবে তারপর আবার আরোহণ করবে উচ্চ স্তরে। জড় থেকে প্রাণের উদ্ভব হয়েছে, কেননা প্রাণ

জড়ের মধ্যে সুপ্ত আছে, প্রাণ, মনের স্তরে উদ্গীত হয়েছে। কারণ প্রাণের মধ্যে মন সুপ্ত ছিল। শ্রীঅরবিন্দের মতে, শূন্য থেকে বিবর্তন সম্ভব নয়।

শ্রীঅরবিন্দের বর্ণিত 'বিবর্তন' একটি বিশিষ্ট চরিত্রের যার সঙ্গে অন্যান্য চিন্তাবিদদের বিবর্তন ভাবনার কোন মিল নেই। কেউ পুনরাবৃত্তিমূলক বিবর্তনের কথা বলেন, কেউ উন্মেষমূলক বিবর্তনের কথা বলেন, কেউ যান্ত্রিক বিবর্তনের কথা বলেন, কেউ বা আবার উদ্দেশ্যমূলক বিবর্তনের কথা বলেন। পুনরাবৃত্তিমূলক বিবর্তন বলে, বিবর্তন হল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কম-বেশি একই আকৃতি ও বিষয়ের পুনঃসংগঠন মাত্র। এ জাতীয় বিবর্তন একই সত্তার পুনরাবৃত্তিমাত্র। এর বিপরীত তত্ত্ব উন্মেষমূলক বিবর্তন। সেখানে বিশ্বাস করা হয়, বিবর্তনের প্রত্যেক স্তরেই নতুন কিছু উদ্ভব হয়। যান্ত্রিক বিবর্তনবাদে সব কিছুকে ব্যাখ্যা করে, পূর্ববর্তী শর্তের ভিত্তিতে আর উদ্দেশ্যমূলক বিবর্তনবাদে বলা হয় বিবর্তনের সব ক্ষেত্রেই একটা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের তত্ত্ব হল 'অখণ্ড বিবর্তনবাদ' (Intergral Evolution)।

শ্রীঅরবিন্দের মতে, বিবর্তনের বৃদ্ধি ঘটে ত্রিবিধ পদ্ধতিতে। এগুলি হল প্রশস্তকরণ (widening), উন্নতিবিধান করা (leightening) এবং অখণ্ড সমন্বয়করণ (integration), এই পদ্ধতিতে কোন কিছুকেই সম্পূর্ণ বাতিল করা হয় না। সব কিছুকেই পরিণামে অখণ্ডভাবে যুক্ত করা হয়। প্রশস্তকরণ পদ্ধতির অর্থ হল নতুন তত্ত্বের জন্য আরো সুযোগ সৃষ্টি করা। দ্বিতীয় পদ্ধতি উন্নতিবিধান করার অর্থ এক ধাপ থেকে আর এক উন্নত ধাপে আরোহণ। কিন্তু বিবর্তনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হল অখণ্ডতা।

শ্রীঅরবিন্দের মতে, বিবর্তনের দুটি ধারা। একটি হল জন্মচক্রের মাধ্যমে বাহ্য শরীরের উন্নতি, অন্যটি অন্তঃস্থ পুরুষের ক্রমবিকাশ। ক্রমবর্ধমন চেতনার জন্য শরীরেরও উপযুক্ত পরিবর্তন প্রয়োজন। একদিকে চেতনার উন্নতি হচ্ছে, অন্যদিকে তার উপযোগী শরীরের বা আধারের সৃষ্টি হচ্ছে। এভাবেই পরিণামে জড় হয়ে উঠবে পরম চিৎপুরুষের পূর্ণ অভিব্যক্তির যোগ্য বাহন।

তাঁর বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে একাধিক আপত্তি উঠেছে। সেগুলি এই রকম:

১) বলা হয় যে চেতনার সপ্ত পর্যায়। জড়ের মধ্যে চিৎপুরুষের অধিষ্ঠান এবং সেখান থেকে এর পুনরুত্থান, জীবের পুনর্জন্ম প্রভৃতিস্বীকার করলেও, জীবের উন্নতি যে অবশ্যম্ভাবী তার যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। আর সচ্চিদানন্দ সৃষ্টি করেছেন আনন্দের জন্য, লীলার জন্য। নূতন সৃষ্টির প্রয়োজন তাঁর থাকতে পারে না, কেননা তাঁর কোন অভাব নেই। তাই বিবর্তনের কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকতে পারে না।

২) শ্রীঅরবিন্দ যেমন মনে করেন, সেইরকম জড়ের পরে প্রাণের এবং প্রাণের পরে মনের উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু মনের পর যে অতিমানসের আবির্ভাব হবেই - তার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই, এই জন্যই যে, মন অপরার্ধের শক্তি, অথচ অতিমানস পরার্ধের শক্তি। অতিমানস উচ্চস্তরের শক্তি হয়ে কেন এবং কিভাবে নিম্নস্তরে মনের মধ্যে নেমে আসবে!

৩) আধুনিক বিজ্ঞান যদিও বিবর্তনবাদকে সমর্থন করে, কিন্তু বিজ্ঞানের এই কথাই যে চরম সত্য এমন বলা যায় না, কারণ এমন অনেক বিষয় আছে, যাকে বিজ্ঞান এককালে সত্য বলতো, কিন্তু বর্তমানে তাদের মিথ্যা বলছে।

৪) জগতে ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টিশীল জীবের স্বধর্ম ভিন্ন ভিন্ন। মানুষেরও নিজের 'স্ব-ধর্ম' আছে। স্বধর্মের মধ্যে মানুষ উন্নতি করতে পারে। কিন্তু স্বধর্মকে অতিক্রম করা মানুষের পক্ষে

ধর্মীয় অভিজ্ঞতা (Religious experience):

তিনি বলছেন, ব্যক্তির উচিত একটি বিশ্বাস নিয়ে শুরু করা - এই বিশ্বাস হল - ধর্মীয় অভিজ্ঞতার বিশ্বাস। মানুষকে আধ্যাত্মিকতার উপলব্ধিতে সক্ষম করে তুলতে পারে ধর্মীয় অভিজ্ঞতা একাই। সুতরাং প্রথমেই আমাদের ধর্মীয় অভিজ্ঞতার প্রকৃতি ও চরিত্র কি তা নির্ধারণ করে ফেলতে হবে। এই অভিজ্ঞতা অন্যান্য সাধারণ অভিজ্ঞতার মতো কেবলমাত্র জ্ঞানের একটা 'আকৃতি' মাত্র নয়, এটি আমাদের দেহের কোন ভঙ্গি বা আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশযোগ্যও নয়। একে 'অভিজ্ঞতা' বলা হচ্ছে, কারণ এর দ্বারা আমাদের এক বস্তুগত সচেতনতা আসে, সঙ্গে আনে এক ধরণের আনন্দ, একজাতীয় অন্তর সন্তুষ্টি। একে আবার বলা হয় 'ধর্মীয়', কারণ এর অদ্ভুত প্রকৃতি - এক অভিনবত্ব - যাকে অভিজ্ঞতার অন্য কোন আকৃতিতে পরিবর্তিত করা যায় না।

রাধাকৃষ্ণণ ধর্মীয় অভিজ্ঞতার কয়েকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথাও উল্লেখ করেছেন। সেগুলি এইরকম :—

১) এটি এক ধরণের অভিজ্ঞতা বিশেষ। এর অর্থ - ক) এটি কোন রকম অসাধারণ অথবা অস্বাভাবিক বিষয় নয়, খ) প্রত্যেক মানুষই একে লাভ করতে পারে, গ) এটি যুক্ত থাকে একটি বিষয়গত সচেতনতার সঙ্গে।

২) এটি সমন্বয়ী এবং অবিভক্ত চেতনা। এই চরিত্রটিই পৃথক করে ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে। সাধারণ অভিজ্ঞতায় বিষয় এবং বিষয়ীর দ্বৈত চরিত্র সব সময় বজায় থাকে। কিন্তু এই অভিজ্ঞতায় বিষয়-বিষয়ীর পার্থক্য থাকে না। এই চরিত্রকে রাধাকৃষ্ণণ বিস্তারিতভাবে বলেছেন, 'It is a condition of consciousness in which feeling are fused, ideas melt into one another, boundaries are broken and ordinary distinctions transcended. Past and present fade away in a sense of timeless being. Consciousness and being are not there different from each other. All being is consciousness and all consciousness being.' (An Idealist View of life, p-91-92).

৩) এটি স্বশাসিত চরিত্রের, কেননা এটি মনের এক স্বাধীন ক্রিয়া। এটি কোনভাবে কোন বাহ্য উপাদান দ্বারা নির্ধারিত হয় না। এর প্রেরণা স্বতঃস্ফূর্ত এবং আন্তরিক।

৪) এটি অনিবার্যভাবেই আন্তরিক এবং ব্যক্তিগত। রাধাকৃষ্ণণ গভীরভাবে হোয়াইটহেড এর দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাঁর মতই তিনিও ব্যক্তির অন্তর জীবনের ওপর ভীষণভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

৫) জাগতিক বিষয় সম্পর্কে নিস্পৃহতা, এই অভিজ্ঞতার অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হল : আমাদের সাধারণ জীবনে স্বাভাবিকভাবে যে সব বিষয়ের প্রতি আমরা আকর্ষণ অনুভব করি, সেইসব জাগতিক বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ; নির্বিকার থাকে এই জাতীয় অভিজ্ঞতার অধিকারী ব্যক্তিরা।

৬) সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া। ধর্মীয় অভিজ্ঞতা হল সমগ্র মানুষের সমগ্র সত্যের প্রতি সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া বিশেষ। এই অভিজ্ঞতা কোনভাবেই আংশিক নয়। এটি 'সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া', কেননা এর মধ্যে যুক্ত থাকে বৌদ্ধিক, নৈতিক, নান্দনিক - একজন মানুষের সমগ্র দিক। তাই তিনি বলছেন, 'The privacy of the individual self is broken into and invaded by the

universal self which the individual feels as his own'.

৭) এই অভিজ্ঞতা ব্যক্তির জীবনে কোনরকম ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না। বরং বাহ্যজগতের অশান্তি, পরাজয়ের ব্যর্থতার মধ্যেও এক সদর্থক শান্তির অনুভূতি নিয়ে আসে মনে, যা ব্যক্তিকে নিজের ওপর আস্থা, শক্তি এবং নির্মল আনন্দকে ফিরিয়ে দেয়।

৮) এই অভিজ্ঞতা আনন্দের সঙ্গে এক অন্তর স্বাধীনতার অনুভূতিও এনে দেয়। জাগতিক জীবনের নানা উৎকণ্ঠা থেকে মানব জীবনে শান্তি বিঘ্নিত হয় এবং যন্ত্রণার অনুভূতি আসে, ফলে মানুষ জাগতিক অবস্থার দাস হয়ে পড়ে। এ সবই ঘটে তার আমিত্বের অহঙ্কারে। ধর্মীয় অভিজ্ঞতা মানুষকে এ সবের বোঝা থেকে অব্যাহতি দিয়ে মুক্তির অনুভূতি এনে দেয় তার মনে।

৯) এই ধরণের অভিজ্ঞতা যদি এক মুহূর্তের জন্যেও কারো জীবনে ঘটে, তার স্বাক্ষর রেখে যায় সমগ্র জীবনে, সেই স্মৃতি এতো গভীর এবং এতো শক্তিশালী যে সেই ব্যক্তি কখনই একে ভুলে যায় না বা তার মনে অস্পষ্ট হয়ে যায় না।

১০) তবে এই অভিজ্ঞতাকে কখনই ব্যাখ্যা করাও যায় না, প্রমাণ করাও যায় না। রাধাকৃষ্ণণ এই অভিজ্ঞতাকে চিহ্নিত করার জন্য নানা শব্দ ব্যবহার করেছেন আত্ম-প্রতিষ্ঠিত (self-established), আত্ম-সাক্ষবহনকারী (self-evidencing) আত্ম-দীপ্তিমান (self-luminous) প্রভৃতি।

১১) এই সব শব্দ ব্যবহার করলেও রাধাকৃষ্ণণ সচেতন ছিলেন যে, এই অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করার মতো শব্দ ভাষায় নেই। ভাষার এই সীমাবদ্ধতার কথাও তিনি বলেছেন। তাই 'স্বজ্ঞার নীরবতা' দ্বারাই একে উপলব্ধির কথা বলেছেন তিনি এভাবে, 'Deep intuition is utterly silent. Through silence we 'confess without confession' that the glory of spiritual life is in explicable and beyond the reach of speech and mind. It is the great unfathomable mystery and words are treacherous.' (An Idealist view of life p-101).

ধর্মের সারসত্তা (Essence of Religion):

ধর্মের সারসত্তা কি এ বিষয়ে বহুকাল থেকে আলোচনা হয়ে আসছে। কেউ ধর্মকে চিহ্নিত করেছেন অনুভূতি হিসাবে, কেউ বা আবেগ, আবার কেউ কেউ একধরণের ভাবপ্রবণতা বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। আবার প্রবণতা, পূজা-পদ্ধতি, কিম্বা আচার-অনুষ্ঠান হিসাবেও ধর্মকে চিহ্নিত করার চেষ্টা হয়েছে। অনেকে আবার ধর্মকে একজাতীয় 'বিশ্বাস' বলে মনে করেন। রাধাকৃষ্ণণ মনে করেন, এইসব দৃষ্টিভঙ্গিই যথার্থ, প্রকৃতপক্ষে এই সবকিছুর সমন্বয় হল ধর্ম। ধর্মের মধ্যে যেমন জ্ঞানগত উপাদান আছে, তেমনি অনুভূতিমূলক উপাদানও আছে। ধর্মের মধ্যে যেমন পূজা-পদ্ধতি ও আচার অনুষ্ঠানের দিক আছে, তেমনি নৈতিকতার দিকও আছে।

বস্তুতঃ রাধাকৃষ্ণণ মনে করেন, ধর্মের মধ্যে বিরোধের মূল কারণ কেবল এক একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় ধর্মের এক একটি দিকের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছে, আর অন্যদিকগুলিকে অবজ্ঞা করেছে, কিন্তু অবহেলিত সেইসব দিকগুলিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। যদি আমরা ধর্মের প্রকৃতির গভীরে যেতে চেষ্টা করি, তবে দেখবো একটা মৌলিক একত্ব আছে সব ধর্মের মধ্যেই। কেবল যখন একটা বিশেষ

ঈশ্বরের গুণসকল (Attributes of God):

ইক্‌বাল ঈশ্বরের যে সকল গুণের ধারণা করেছেন সাধারণত সেগুলিকে তিনি ইসলাম ধর্মের ঐশ্বরিক বিশ্বাস থেকেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ইক্‌বালের ব্যাখ্যা তাঁর দর্শনের কেতাবী শিক্ষার পরিচয় বহন করে। যে সকল গুণের উপলব্ধি করা যায় স্বজ্ঞালব্ধ অন্তরদর্শনের সাহায্যে আর যেসব গুণকে জানা যায় বৌদ্ধিক চিন্তার দ্বারা তিনি এ দুয়ের বিভাজন করেছেন। তাঁর মতে, এক অর্থে প্রথম শ্রেণীর গুণগুলিকে গুণই বলা যায় না, কারণ এগুলোকে আমরা বুঝে থাকি ঈশ্বরের 'সারসত্তা' (essence) হিসাবে। যেমন একত্ব, অহং ইত্যাদি। এ জন্যই ইক্‌বাল দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ বৌদ্ধিক গুণগুলিরই বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেগুলো হল সৃষ্টিশীলতা, জ্ঞান, সর্বশক্তিমত্তা চিরস্থায়িত্ব, অতিব্যাপ্ততা, অতিক্রমতা ইত্যাদি।

সৃষ্টিশীলতা (Creativeness):

এই গুণটি ঈশ্বরের অবশ্যম্ভাবী গুণ হিসাবে বিবেচিত হয়। এই জন্যই যে ইক্‌বালের দর্শনে ঈশ্বরকে কল্পনা করা হয় 'অহং' হিসাবে। একটি অহং-জীবনকে অবশ্যই সৃষ্টিশীল জীবন বলা যায়। সর্বোচ্চ অহংও সৃষ্টিশীল-যেভাবে একটি 'অহং' সৃষ্টিশীল। কিন্তু ইক্‌বাল এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে গিয়ে একটি সমস্যার কথা অনুভব করেছেন। ঐশ্বরিক সৃষ্টিশীলতার প্রশ্ন আর একটি প্রশ্নের উদ্ভব ঘটায় : কি প্রকারে ঐশ্বরিক সৃষ্টিশীলতা অগ্রসর হবে সৃষ্টি পদ্ধতিতে?

প্রাসঙ্গিকভাবে ইক্‌বাল মুসলিম ঈশ্বরতত্ত্বের একটি গোঁড়া অথচ জনপ্রিয় 'আসরাই' (Ashraite) সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে, এই জগৎ অতি সূক্ষ্ম অবিভাজ্য পরমাণুসকল দ্বারা গঠিত, এগুলিকে বলা হয় 'জাওয়াহির' (Jawahirs)। ঈশ্বরের সৃষ্টিশীল শক্তি প্রতিমুহূর্তে সৃষ্টি করে চলেছে সতেজ, টাটকা পরমাণুসকল। এমনকি তাঁদের মতে 'স্থান'ও (Space) পরমাণুগুলির সমন্বয় ছাড়া আর কিছু নয়ই। যদিও জগৎ সম্পর্কে পরমাণু তত্ত্ব আধুনিককালেও সুপরিচিত। কিন্তু ইক্‌বাল আসরাই মতকে সম্পূর্ণ সমর্থন করতে পারেননি। কারণ পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণের সঙ্গে এই মতকে সমন্বয় করার ক্ষেত্রে সমস্যা আছে।

সুতরাং তিনি ঈশ্বরের সৃষ্টিশীলতা গুণটিকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলছেন, সর্বোচ্চ অহং অথবা ঈশ্বর সৃষ্টি করেন অন্তর পথে। এর অর্থ হল তিনি সৃষ্টি করেন সম্পূর্ণ তাঁর নিজের মধ্য থেকে। সীমিত সৃষ্টি ঘটে থাকে অন্যের সত্যতাকে পূর্বানুমানের দ্বারা। কিন্তু সর্বোচ্চ অহং এর ক্ষেত্রে কোন 'অন্য কিছু' নেই, সবই তার মধ্যে। সুতরাং তাঁর ক্ষেত্রে সৃষ্টির অর্থ হল - তাঁর অন্তর সম্ভাবনাগুলিকে কেবল প্রসারিত করা। তাঁর সৃষ্টিশীলতা অসীম, কারণ তাঁর সম্ভাবনাগুলিও অসংখ্য।

জ্ঞান (Knowledge):

ঐশ্বরিক জ্ঞানকেও এইরকমভাবে বোঝা হয় ইক্‌বালের দর্শনে। জ্ঞান যখন 'সীমিত অহং' (finite ego) এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তখন অহং এলোমেলো উদ্দেশ্যহীন অথবা বৌদ্ধিক জ্ঞান। এই জ্ঞানের ভিত্তি হল 'জ্ঞাতা' এবং 'জ্ঞেয়'- এই দুই এর বিভাজন। সুতরাং সীমিত অহং জ্ঞানে 'অন্যকে' (the other) জ্ঞাতা (subject) থেকে জ্ঞানের বিষয় (object of knowledge) কিছু ভিন্ন হয়। কিন্তু ঈশ্বরে যেহেতু সকল কিছুই অন্তর্ভুক্ত, তাই ঈশ্বরে আর অন্য বলে কিছু নেই। সুতরাং ঐশ্বরিক জ্ঞানকে এইরকম বৌদ্ধিক জ্ঞান বলা চলে না। তাই তাঁর মধ্যে চিন্তা এবং কর্ম, জ্ঞান ক্রিয়া এবং সৃষ্টিক্রিয়া সমার্থক। ঐশ্বরিক জ্ঞান হল সৃষ্টিমূলক দ্রষ্টা, যেহেতু ঈশ্বরের বাইরে আর কিছুই নেই। তিনি নিজেই তাঁর জ্ঞানের বিষয়। তিনি সৃষ্টি করেন, যেমন, তিনি জানেন, এবং জানেন - যেমন তিনি সৃষ্টি করেন। তাই ঐশ্বরিক জ্ঞানকে বুঝতে হবে 'সজীব এবং সৃষ্টিমূলক ক্রিয়া' (living and creative activity) হিসাবে - ঠিক একটি 'আত্ম-প্রতিবিম্ব প্রদানকারী আয়নার মতো।

'সর্বশক্তিমত্তা' (Omnipotence):

এটি ঈশ্বরের এমন অন্ধ খেয়ালী শক্তি - যার কোন সীমা নেই বলে আক্ষরিক অর্থে মনে করা হয়। কিন্তু ইক্‌বালের মতে, কোরাণ ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা গুণটিকে এইভাবে দেখে না।

কোরাণে ঐশ্বরিক সর্বশক্তিমত্তা আন্তরিকভাবে যুক্ত ঐশ্বরিক বিচক্ষণতার ধারণার সঙ্গে। এ জন্য যখনই কোরাণে ঐশ্বরিক সর্বশক্তিমত্তার সাম্যের কথা বলা হয়েছে, তখনই কেবল নিয়ম-শৃঙ্খলার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা গুণটি এই জগতে অমঙ্গলের অস্তিত্বের সমস্যার উদ্ভব ঘটায়—এই অভিযোগ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের একটি সুপরিচিত বিষয়। বেদনার ঘটনা এতোই সার্বিক এবং কষ্টের অভিজ্ঞতা এতোই জীবন্ত যে এই সমস্যাটিকে তুচ্ছ একটি সমস্যা বলে বাতিল করে দেওয়া যায় না। ইক্‌বাল এর গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, এবং এই সমস্যাটিকে সমাধান করতে চেয়েছিলেন ঐশ্বরিক সর্বশক্তিমত্তার সঙ্গে অমঙ্গলের ধারণা সঙ্গতিপূর্ণ বলে। তিনি উল্লেখ করেছেন এপ্রসঙ্গে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের আদম এবং ইভ এর কাহিনী আর কোরাণের কিছু কথা। এর থেকে মানুষের প্রথম ঈশ্বরের নির্দেশ অমান্য করার ঘটনাকে তিনি মানুষের 'আদিম পাপ' বলে বর্ণনা করেছেন। আর এর ফলেই মানুষের পতন ঘটেছে। এখানে পাপ এবং কষ্টের উপস্থিতিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে দৈহিক এবং নৈতিক অমঙ্গল হিসাবে।

ইক্‌বাল বিষয়টিকে দেখেছেন ভিন্নভাবে: তিনি অনুভব করেছেন যে মানুষের প্রথম ঈশ্বরের নির্দেশ অমান্য করার ঘটনা হল আসলে মানুষের প্রথম 'মুক্ত নির্বাচন' (free choice) এর ঘটনা। বস্তুতঃ স্বাধীনতা হল ভালত্বের অবশ্যম্ভাবী প্রাক্-শর্ত। স্বাধীনতার মধ্যে বিপদের ঝুঁকি আছে, কারণ যদি মানুষকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়, সে এটাকে দুইভাবেই ব্যবহার করতে পারে। সে তার স্বাধীনতাকে যথাযথভাবে যেমন ব্যবহার করতে পারে, তেমনি ভুল নির্বাচন করার সম্ভাবনাও তার মধ্যে থেকে যাচ্ছে। সুতরাং ইক্‌বাল বলছেন ঈশ্বর জেনেশুনেই মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। এর মধ্যে ঝুঁকি আছে, কিন্তু এই ঝুঁকি সত্ত্বেও ঈশ্বর মানুষকে মুক্ত করেছেন এজন্যই যে মানুষের প্রতি তাঁর অপরিমেয় বিশ্বাস আছে।

সম্ভবতঃ এটাই হল একমাত্র পথ, যার দ্বারা মানুষের মধ্যে যে সুপ্ত অনন্ত সম্ভাবনাগুলি আছে তাকে বার করে আনা যাবে। এই দিক থেকে বেদনা এবং কষ্ট হল স্বাধীনতার অবশ্যম্ভাবী দিক। ইক্‌বাল বলছেন, "Good and evil.. though opposites must fall within the same whole."

সুতরাং অমঙ্গল কখনই ঐশ্বরিক সর্বশক্তিমত্তার সঙ্গে বিরুদ্ধতা করে না। সর্বশক্তিমত্তাকে কখনই ইচ্ছামতো সবকিছু করার ক্ষমতা বলে গণ্য করা হয় না। এই দৃষ্টিকোণকেই যুক্তিসম্মত ধারণা বলা যায়, কেননা এই দৃষ্টিকোণ মানুষের আবেগগত এবং বৌদ্ধিক উভয়দিককেই সন্তুষ্ট করে। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে অমঙ্গলের সঙ্গে ঈশ্বরের শক্তির সঙ্গতিপূর্ণ বলা যায়।

চিরস্থায়িত্ব (Eternity):

'চিরস্থায়িত্ব' বিষয়টিকে ইক্‌বাল 'সময়' (time) এর ধারণা হিসাবে বোঝেননি, এর অর্থ শেষহীন সময়ের ধারণা নয়। 'সময়' বলতে আমরা বুঝে থাকি পর পর মুহূর্তগুলির মিছিল। ইক্‌বাল তাকে 'সময়' বলছেন না। 'প্রকৃত সময়' হল তার কাছে 'স্থিতিকাল' (duration) - যা পেছনে কোন কিছুকেই ফেলে যায় না এবং যা কিছু ঘটে সবেরই যা সম্ভাবনা। ঈশ্বর হলেন 'চিরকালীন', কারণ তিনি হলেন সমস্তরকম প্রকাশ ঘটনার সম্ভাবনা। ঈশ্বরের মধ্যে যে অনন্ত

সম্ভাবনাগুলি নিহিত আছে, তা প্রকাশের একটা পদ্ধতি হল সময়। এই অর্থে ঈশ্বর হলেন চিরকালীন।

পরিব্যাপ্ততা এবং অভিক্রমতা (Immanence and Transcendence):

যদিও ইকবালের ঈশ্বরতত্ত্ব কোন ধর্মতত্ত্বে বিশ্বাসী নয়। কিন্তু ঈশ্বরের গুণ হিসাবে 'অভিক্রমতা'কে (Transcendence) তিনি স্বীকার করেছেন, পরিব্যাপ্ততা গুণ সাধারণত যুক্ত থাকে ঈশ্বরের সর্বেশ্বরবাদী চরিত্রের সঙ্গে। ইক্‌বাল সর্বেশ্বরবাদের বিরুদ্ধে মত পোষণ করতেন, এজন্যই ইক্‌বাল ঈশ্বরের সবকিছুকে অতিক্রম করে যাওয়ায় গুণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি পরিব্যাপ্ততাকে সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন। তিনি বলেছেন, ঈশ্বর উভয়ই। ঈশ্বর এই অর্থে জগতে পরিব্যাপ্ত নয় - যে অর্থে সর্বেশ্বরবাদে বলা হয়। ঈশ্বর এই অর্থে পরিব্যাপ্ত যে এই জগৎ তাঁর সৃষ্টি। এই কারণেই জগৎ প্রতিবিম্বিত করে এর সৃষ্টিকর্তার অহং-প্রকৃতিকে।

ঈশ্বর সবকিছুকে অতিক্রম করে যায়, কারণ সর্বোচ্চ অহং কখনই কোন সীমিত অহং এর ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে থাকে না। পরিব্যাপ্ততা এবং অভিক্রমতা চরিত্র দুটিকে ভিন্নভাবেও বোঝা যেতে পারে। ঈশ্বর এই জগতের পরিব্যাপ্ত কারণ এই জগৎ হল ঐশ্বরিক সম্ভাবনার এক প্রকাশ। এটি এই জগৎকে অতিক্রম করে যায়, কারণ অন্য আরো অনন্ত সম্ভাবনাগুলো আছে, যেগুলি এখন পরিব্যাপ্ত হওয়ার অপেক্ষায় আছে।